অহিংসা (Ahimsa or Non-violence)

ভূমিকা (Introduction) ঃ শাসন, শোষণ, উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানানো মানুষের এক স্বভাব-সিদ্ধ কর্মপদ্ধতি। কারণ মানুষ হল স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয়। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিক্ষোভ জানানোর পদ্ধতি হয়ে থাকে হিংস্র ও সশস্ত্র। সে কারণেই আজকাল আমরা প্রতিবাদ বলতে সাধারণত সশস্ত্র বা হিংস্র বিপ্লবকেই বুঝে থাকি। আধুনিক কালের বিভিন্ন প্রকার বিক্ষোভ ও বিক্ষোভের এই পদ্ধতিকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু ভারতে জাতির জনক মাহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার পূর্বে অত্যাচারী এবং উৎপীড়ক বিদেশী তথা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই অভিনব পদ্ধতিটিই হলো **অহিংসা (Non-violence)**। অহিংসার মূল লক্ষ্য হলো শান্তি ও প্রেম। জাতির জনক মাহাত্মা গান্ধীকে তাই অহিংসা, প্রেম, শান্তি এবং স্বাধীনতার অগ্রদূত রূপে চিহ্নিত করা হয়। তিনি প্রথম অহিংসা আন্দোলনের শুরু করেছিলেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে। গান্ধীজির এই আন্দোলন তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও বলীয়ান শেতাঙ্গ সরকারকে পর্যুদস্ত করেছিল। এর পর তিনি স্বদেশে এই একই 'অহিংসা নীতির সাহায্যে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই অহিংসা নীতির প্রয়োজনেই ১৯২০ সালে অহিংসা আন্দোলন (Non-cooperation Movement), ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন (Satyagraha or Civil Disobedience Movement), ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলি সংগঠিত করেছিলেন। আবার ১৯৪৬ সালে ইংরেজ শক্তির প্ররোচনায় ভারতবর্ষে যখন জাতিগত দাঙ্গা ভয়ানক রূপ ধারণ করে তখন গান্ধীজি অহিংসা নীতির প্রয়োগেই শান্তি পদযাত্রা শুরু করেন। এবং এ পথেই তিনি শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

অহিংসার উৎস ঃ গান্ধী দর্শনে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, এবং এদের মধ্যে অন্যতম হলো 'অহিংসা' (Non-violence)। 'অহিংসা' শব্দটি বহুপূর্বে ছান্দোগ্য উপনিষদে পরিলক্ষিত হয়। এখানে পাঁচটি নৈতিক আদর্শকে (Ethical values) জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করা হয়। এই পাঁচটি নৈতিক আদর্শ হল যথক্রমে— অহিংসা (Non-violence), কঠোর আত্মসংযম (Austerity), ভিক্ষা (Alms giving), সততা (Uprightness), এবং সত্যতা (Truthfulness)। পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন নীতিতত্ত্বে। এদের মধ্যে অন্যতম হল অহিংসা। পরবর্তী পর্য্যায়ে প্রাচীনকালে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে এবং বৌদ্ধ ও জৈন নীতিতত্ত্বে এই অহিংসা নীতি পর্য্যবেক্ষিত হয়। মহাভারতে বলা হয়েছে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ"। অর্থাৎ, অহিংসাই হল পরম ধর্ম। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মেরও মূল ভিত্তি হল অহিংসা। জাতির জনক গান্ধীজি এই সমস্ত ধর্মের নৈতিক ভিত্তি যে 'অহিংসা' তার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবন দর্শনেও

Scanned with CamScanner

অহিংসা নীতির প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে—সর্বক্ষেত্রেই এই অহিংসা নীতির প্রয়োগ করেছিলেন। মানবজীবনের মৌলিক ভিত্তি হিসাবেই তিনি অহিংসাকে গ্রহণ করেছেন।

অহিংসার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ 'অহিংসা' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল—'ক্ষতি বা হিংসা করা থেকে নিবৃত হওয়া"। 'অ' + 'হিংসা' = অহিংসা। 'অ' শব্দের অর্থ এখানে 'না' বা নিবৃত্ত হওয়া, এবং 'হিংসা' শব্দের অর্থ হলো "দ্বেষ" বা "আঘাত"। সুতরাং কাউকে আঘাত না করা, বা কারোর প্রতি দ্বেষ না করাই হল অহিংসার অর্থ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, 'অহিংসা' একটি নঞর্থক শব্দ। এটি নঞর্থকতার অতিরিক্ত কিছু। এই শব্দটির মধ্যে একটি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিলক্ষিত। সুতরাং পরিপূর্ণ অহিংসার অর্থ হলো—"ক্ষতি বা দ্বেষ করার মানসিকতাকে অস্বীকার করে কোনো কাজ করা।" অহিংসা সম্পর্কে গান্ধীজির মূল অবদান হলো যে, তিনি ধর্মীয় আলোচনার গণ্ডী থেকে অহিংসাকে মুক্ত করে তাকে আরো ব্যাপকভাবে অর্থবহ করে সমাজ এবং রাজনৈতিক স্তরে একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা। অহিংসা তাই গান্ধীজির কাছে একটি নীতিই নয়, এটা একটা পদ্ধতিও বটে। এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ফলেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে। অহিংসা ও সত্যের পূজারী মহাত্মা গান্ধী তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। গান্ধীজি সত্য এবং অহিংসাকে মানবজীবনের অবশ্য পালনীয় মূলনীতি বলে মনে করতেন।

ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে অহিংসার আদর্শ ঃ গান্ধীজি অহিংসা প্রসঙ্গে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এবং মনুসংহিতার মূল নীতিতত্ত্বের উল্লেখ করেন। আবার হিন্দু নীতিতত্ত্বের সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধদেরও নীতিতত্ত্বের তুলনা করে বলেন যে—এগুলি হল মূলতঃ একই মুদ্রার ভিন্ন ভিন্ন দিক। কিন্তু প্রত্যেকের উদ্দেশ্য একই, কারণ প্রত্যেকেই সত্য (Truth), অহিংসা (Non-violence) এবং তপস্যার (Meditation) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, এবং এগুলিকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। গান্ধীজি অহিংসার এই প্রাচ্য ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের উদারনীতিবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আরো বলা যায় যে, তিনি ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ইউরোপীয় চিন্তাধারার দ্বারা যে গান্ধীজি অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদ তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি, রাষ্ট্র নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং বিবেকবোধের উপর তিনি অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিতেন। গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি টলস্তয়, রাস্কিন এবং থোরো প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তাবিদের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, টলস্তয়ের *'The Kingdom of God is Within You'* বইটি তাঁর মনে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে। রাস্কিনের (Ruskin) *"Un to the Last"* বই পড়ে তিনি কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের ভেদরেখা ভুলে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। একজন বুদ্ধিজীবির শ্রম আর একজন কায়িক শ্রমিকের শ্রমের মধ্যে কোন পার্থক্য রেখা

Scanned with CamScanner

টানতে চান্ নি। আর প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক থোরোর (Thoreau) *Civil Disobedience* বইটি তাঁকে সত্যাগ্রহের পথে অনুপ্রাণিত করেছে। কাজেই গান্ধীর দর্শনকে কেবল প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী রূপে অভিহিত করা সঙ্গত নয়, তা পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে আরো সমৃদ্ধ ও পরিশ্রুত রূপ হিসাবে স্বীকৃত।

গান্ধীজি ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবনের সব কিছুকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে। রাজনীতির ক্ষেত্রকেও তিনি একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সব ধরনের হিংসাকে পরিত্যাগ করে, অহিংসার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর মতে, শুধু যদি শারীরিক ভাবেই নিপীড়ন করা হয় তাহলেই তাকে হিংসা বলে না, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে নিপীড়নকেও তিনি হিংসা রূপে উল্লেখ করেছেন। এটাই হলো গান্ধীর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার বিরোধিতার মূল উৎস। রাষ্ট্রকে তিনি ব্যক্তির উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নকারী রূপে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রকে তাই তিনি সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত হিংসার বাহন রূপে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটিয়ে। অথচ সমস্ত প্রকার প্রগতির মূলেই থাকে ব্যক্তিসত্তা। এই ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দিয়ে সমাজ কখনই এগিয়ে চলতে পারে না। সমাজের কল্যাণের অর্থই হল ব্যক্তির কল্যাণ। ব্যক্তির কল্যাণ, ব্যক্তির মঙ্গল, ব্যক্তির উন্নতি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে একমাত্র অহিংসার মন্ত্রেই।

গান্ধীজি পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রভূত সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, হিংসার দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। একমাত্র অহিংসার ভিত্তিতেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের উপর অত্যাচার চালানো হয়, হিংসার পথ অনুসরণ করা হয়—তা চেঙ্গিস খাঁর স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার থেকেও অনেক খারাপ। তাঁর মতে, একমাত্র অহিংসার বিজ্ঞানই মানুষকে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ গণতন্ত্র দিতে সক্ষম। এজন্যই তিনি রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের (Stateless Democracy) কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন এখনই এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যার কাজ নাগরিকদের দমন করা নয়, যার কাজ হবে অহিংসার মন্ত্রে সকলকে উদ্দীপ্ত করা, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক সবদিক থেকেই মানুষকে স্বাধীন করা।

অহিংসার আলোকে উদ্দীপিত হয়ে গান্ধীজি ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন—উভয়ক্ষেত্রেই নৈতিকতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ জন্য তিনি রাষ্ট্রকেও বিচার করেছেন নৈতিকতার দিক থেকে। তিনি তাই সবদিক থেকে পূর্ণস্বাধীনতা তথা স্বরাজের আদর্শকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। আবার রাষ্ট্র যেহেতু ব্যক্তির উপর দমননীতি প্রয়োগ করে সেইহেতু তিনি রাষ্ট্রেরও বিরোধিতা করেন। তিনি তাই একটি আদর্শ সমাজের দাবি অঙ্কন করেছেন—যা প্রকৃতপক্ষে 'রাষ্ট্রহীন সমাজ' নামেই স্বীকৃত। তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতার পূর্ণ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রহীন সমাজকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেন, এবং ঐ অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রাথমিক স্তরেই অহিংসা নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই অহিংসা নীতির মাধ্যমেই তিনি "অহিংস-রাষ্ট্রের" (Non-violence State) প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

গান্ধীজি মনে করেন যে, শুধু পাশবিক বল প্রয়োগই হিংসার প্রকাশ নয়। বিভিন্ন রকম সামাজিক ব্যাধি, যথা অস্পৃশ্যতা, সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়নও হিংসার বিভিন্ন প্রকাশ। এগুলি হল ঘৃণা ও বিদ্বেষের সহযোগী, আর প্রেমের পরিপন্থী। এগুলিকে বর্জন করতে হবে। অহিংসার মন্ত্রই শুধু উদ্‌যাপিত করতে হবে। কারণ, হিংসা কখনই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, অহিংসাই সত্যকে উদঘাটিত করতে পারে। অহিংসা ছাড়া মানুষের জীবনের কোন মূল্যই নেই। নৈতিকতার আলোকে যা আলোকিত নয়, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। একমাত্র অহিংসার বাণীই মানব মনে পরিপূর্ণ নৈতিকতাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। অহিংসার কাজ হলো—দ্বিবিধ। একদিকে তা মানুষকে অন্যায় কর্ম থেকে নিরত রাখে, অপর দিকে তেমনি সত্যকে (Truth) জানতে সাহায্য করে। অহিংসা তাই কেবল একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তা একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রূপেও স্বীকৃত।

সত্য ও অহিংসা (Truth and Non-violence) ঃ ইংরেজদের অসি শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে, গান্ধীজি মানব সভ্যতার আন্দোলনে এক নতুন অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে ছিলেন, এবং সেই অস্ত্র হল—সত্য ও অহিংসার নীতি (Truth and Non-violence)। কারণ, তিনি স্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সত্য ও অহিংসার নীতির মাধ্যমে আবদ্ধ ফল শাশ্বত ও চিরকালীন। অসি শক্তির বা বলপ্রয়োগের দ্বারা কখনো স্থায়ী সুফল লাভ করা যায় না। সাময়িকভাবে তা শত্রুকে দমিয়ে রাখতে পারে। অসি শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজির মত তাই ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারকালে ব্রুক (Bruke) প্রদত্ত যুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রুকের মতে, অস্ত্রের ভয়ে শত্রুকে সাময়িকভাবে দমন করতে সক্ষম হলেও সুদূরপ্রসারী চিরন্তন ফল লাভ একেবারেই অসম্ভব। এই যুক্তিরই প্রতিধ্বনি করে গান্ধীজি বলেন, অস্ত্রভয় শত্রুকে সাময়িকভাবে দমন করলেও, তা অত্যন্ত ক্ষণিক। তাই সত্য ও অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ সবসময়ই অস্ত্রবলকে পরিহার করে, প্রেম ও আত্মিক বলে বলীয়ান হবার চেষ্টা করে।

সত্য ও অহিংসার স্বপক্ষে গান্ধীজির **দ্বিতীয় যুক্তি** হলো যে, অসি শক্তির দ্বারা পরাভূত ব্যক্তি সর্বদাই প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগে থাকে। যখনই তার প্রতিপক্ষ কোন না কোনভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই সে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। এইভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা মানুষকে অস্ত্রশক্তির অনুসারী করে তোলে। ফলত মানুষ ক্রমান্বয়ে হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে ওঠে। আর এই হিংস্রতাই মানুষকে আদর্শ সমাজ গঠনে বাধা দান করে। সুতরাং অস্ত্রের শক্তি নয়, সত্য ও অহিংসার শক্তিই একমাত্র কাম্য।

তৃতীয়ত, সত্য ও অহিংসার সওয়ালে গান্ধীজি আরো বলেন যে, অসি শক্তির ক্ষেত্রে পরাভূত ব্যক্তি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে বলেই, প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় হিসাবে সশস্ত্র বিপ্লবের পথকে গ্রহণ করে। প্রতিশোধের এই পন্থা গ্রহণ করলে মানুষের মনে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, ঘৃণা ও হিংসার উদ্রেক হয়। ফলত সমগ্র মানব জাতি এক দয়াহীন, ক্ষমাহীন, রূঢ় এবং ভয়ঙ্কর সমাজের অধিবাসী রূপে পরিগণিত হয়ে ওঠে—যা সভ্য মানব সমাজের কাছে আদৌ কাম্য নয়। সুতরাং সত্য ও অহিংসাই হলো একমাত্র পথ—যা মানুষকে শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির নিশানা দিতে পারে।

চতুর্থত, অসি শক্তির বিরুদ্ধে এবং সত্য ও অহিংসার স্বপক্ষে গান্ধীজির আরো এক

Scanned with CamScanner

জোরালো আধ্যাত্মিক যুক্তি এই যে, অসি শক্তির ব্যবহারকারীরা বল্ প্রয়োগের ফলে নিজের আত্মাকেই ছোটো করে ফেলে। তাঁরা যেন বিস্মৃত হয় সেই বিবেক বাণী থেকে—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। তারা তাই প্রকৃত মানুষ হিসাবে মানুষের পরিচয় বহন করতে অক্ষম হয়। নিজেকে সে ঈশ্বরের কাছে ঘৃণার পাত্র করে তোলে। সে বিস্মৃত হয় যে প্রতিটি জীবই হল ঈশ্বরের সন্তান। আমরা যখন এই সত্যকেই ভুলে যাই, তখনই নিজের এবং অপরের ঐশ্বরিক মহিমার কথা বিস্মৃত হই। একমাত্র তখনই অন্যের বিরুদ্ধে পাশবিক শক্তির প্রয়োগের কথা চিন্তা করা হয়। গান্ধীজি তাই বলেন, নিজ আত্মার-মহিমা রক্ষার্থে সত্ত্ব ও অহিংসার পথ অনুসরণ করাই শ্রেয়তর।

পঞ্চমতঃ, অপরদিকে দয়া, প্রেম ও ভালবাসার পথ যে কত সুদূর প্রসারী ও ফলপ্রসূ তা প্রকাশ করার জন্য গান্ধীজি একটি পারিবারিক উদাহরণের অবতারণা করেছেন। ধরা যাক্, কোন পিতা মদ্যপ ও বিপথগামী। তিনি পুত্রের সংসারে আর্থিক অধোগতির কারণ হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে পুত্রের কি করণীয়? পুত্র কি পিতাকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করবেন? নিশ্চয়ই নয়। এক্ষেত্রে সুপুত্রের উচিত কর্ম হল—মদ্যপ ও বিপথগামী পিতার চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে পুত্র নিজে কষ্ট ভোগ করবেন। অনশন-সত্যাগ্রহ করবেন এবং প্রয়োজন হলে নিজে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবেন। গান্ধীজি প্রবর্তিত এবং প্রদর্শিত এই আদর্শমূলক বিক্ষোভ পন্থাই হল অসি শক্তির বিরোধী পন্থা এবং সত্য ও অহিংসার অনুসারী পন্থা।

গান্ধীজির মতে, সত্য ও অহিংসার মাধ্যমে বিক্ষোভের ফলে, মানুষ কোনোদিনই ছোট হয় না। বরং বলা যায় যে, এর মাধ্যমে মানুষ আরো মহান হয়। তাছাড়াও বলা যায় যে, সত্য ও অহিংসার বল এতই বেশি যে তাতে পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এ বল হল আত্মিক বল—যা সমস্ত সমস্যার সমাধানে প্রযোজ্য। আধুনিক কালের নক্ষত্র যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে মানুষ সমস্বরে বলতে চায়—"যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই"। গান্ধীজির মতে, পৃথিবীতে যে আজও এত লোক বেঁচে আছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী অসি শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু, দয়া, সত্য ও অহিংসার আত্মিক বলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের স্বপক্ষে ইতিহাসের প্রধান প্রমাণ এই যে, পৃথিবীতে এত যুদ্ধের তাণ্ডব চললেও, মানবজাতি এখনও বেঁচে আছে, সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এখনও সমগ্র পৃথিবী পুলিশী থানায় পরিণত হয়ে যায় নি। কারণ, এখনও মানুষ আর্তের সেবা করে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করে, তৃষ্ণার্তকে জলদান করে, পরদুঃখে মানুষ কাতর হয়। অর্থাৎ, মানুষ এখনও তার মনুষ্যত্বকে হারায় নি। এটাই প্রমাণ করে যে, অস্ত্রের শক্তি ছাড়াও অন্যকোন এক দুর্বার শক্তি এই বিশ্বসংসারকে পরিচালিত করছে এবং সেই শক্তি—যা সত্য ও অহিংসার আলোকে উদ্ভাসিত।

অহিংসা ও সত্যাগ্রহ (Nonviolence and Satyagraha) ঃ গান্ধীজির অহিংসা নীতির একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো সত্যাগ্রহ আন্দোলন। সত্যাগ্রহের অর্থ হলো—সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। সত্যাগ্রহ = সত্য (Truth) + আগ্রহ (Devotion to Truth)। সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংসাভিত্তিক অসহযোগ আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীরা সামাজিক বৈষম্য এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যে আপোসহীন আন্দোলন করেছিলেন

Scanned with CamScanner

সেই আন্দোলন ছিল সত্য ও অহিংসা নীতির উপরে প্রযোজ্য। সত্য ও অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আন্দোলনই হলো সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন প্রথম পরিচালিত হয়। এই সত্যাগ্রহ পদ্ধতি যদিও প্রাথমিক ভাবে ইংরেজ শাসকবর্গকে খুব বেশি বিচলিত করতে পারে নি, তবুও যতদিন গান্ধীজির নেতৃত্বে এই অভিনব বিক্ষোভ পরিচালিত হয়েছে, ততই ক্রমাগতভাবে এই বিক্ষোভ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে ইংরেজ শাসকবর্গ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাদের বিদায় ঘণ্টার ধ্বনি ধ্বনিত হতে চলেছে। পরিশেষে ইংরেজ শাসককুল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, এবং স্বাভাবিক পরিণতিতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

গান্ধীজি প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ইংরেজীতে 'Passive Resistance' বা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' নামে অভিহিত করা হয়। তবুও গান্ধীজি মনে করেন যে, সত্যাগ্রহ শুধুমাত্র "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" নয়। কারণ, গান্ধীজির মতে, 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" শব্দটি নিছকই নেতিবাচক। সত্যাগ্রহ একদিকে যেমন হিংসা থেকে বিরত থাকার কথা বলে, অপরদিকে তেমনি মানুষকে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করে। অত্যাচারী যেন বুঝতে পারে যে, সে যা করছে তা অন্যায়, এটা তার করা উচিত নয়। এভাবেই সে হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলত শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের দ্বারা গান্ধীজি প্রদর্শিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পিছনে যে মূল শক্তি কাজ করে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটান সম্ভব নয়।

আক্ষরিক অর্থে সত্যাগ্রহের অর্থ হল ঃ "সত্যের প্রতি নিষ্ঠা"। এরূপ নিষ্ঠার ফলে সত্যাগ্রহী একতা তুলনীয় শক্তির অধিকারী হন। গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঠিক সশস্ত্র শক্তির বিপরীত। সত্যাগ্রহ তাই কখনই মানবীয় বাহুবল অথবা অস্ত্রবলকে সূচিত করে না। এটি শুধু মানুষের আত্মিক বলকে সূচিত করে। সুতরাং সত্যাগ্রহী যে শক্তির প্রয়োগ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে তা কখনই দৈহিক শক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে তাই হিংসার কোন স্থান নেই। কারণ, গান্ধীজি মনে করেন যে, হিংসা কখনই কোন সমস্যার সার্বিক ও চিরস্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম নয়। তাঁর মতে, অহিংসা এবং প্রেম শক্তির জয় সর্বত্র, এবং তার প্রয়োগও সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রসূ। ফলত সত্যাগ্রহ আন্দোলন যেমন ইংরেজদের মতো শক্তিশালী ও হিংস্র শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য, তেমনি তা আবার নিজের আত্মীয় পরিজনদের বিরুদ্ধেও ফলপ্রসূ।

সত্যাগ্রহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলনকে পরিচালনা করে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনি সত্যকারের উপলব্ধিতেও তা সাহায্য করে। গান্ধীজির মতে, প্রকৃত প্রেম কখনই অন্যকে দাহ করে না, তা শুধু নিজেকেই নিজে দহন করে। সুতরাং সত্যকারের প্রেমের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সত্যাগ্রহী সানন্দে অন্যায়ের প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। কারণ, অন্যায় এবং অন্যায়কারীর পার্থক্য কখনই একজন সত্যাগ্রহী বিস্মৃত হতে পারে না। সত্যাগ্রহী তাই অন্যায়কে ঘৃণা করেন, অন্যায়কারীকে নয়। অন্যায়কারীর উপর কখনই তার ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব তথা তিক্ততা থাকে না। কারণ প্রত্যেকটি সত্যাগ্রহীই বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে এমন কোন নীচ বা হীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ থাকতে

Scanned with CamScanner

পারে না, যাকে প্রেমের অস্ত্র দ্বারা জয় করা যায় না। আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি এবং আত্মউপলব্ধি—এ সবই হল একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহীর গুণাবলী। গান্ধীজির মতে, যিনি সত্যাগ্রহী হিসাবে অভিহিত হবেন, তিনি অবশ্যই একজন প্রকৃত ধর্মযোদ্ধারূপে পরিগণিত হবেন। আর যেহেতু সত্যাগ্রহী একজন প্রকৃত ধর্মযোদ্ধা, সেহেতু তিনি যে সমস্ত পাপ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সেগুলি যেন তাকে স্পর্শ না করে। তিনি সর্বদা অভিনিরিখ ও প্রার্থনাময় চিত্তে আত্মনিরীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখবেন যে, তিনি নিজে ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং হিংসার প্রভাব থেকে মুক্ত কি-না। সত্যাগ্রহী তাই সর্বদাই এই বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হবেন যে, সত্যাগ্রহ হল সত্যনিষ্ঠার শক্তি, প্রেমের শক্তি। এটি যৌনশক্তি, বাকশক্তি, এবং অসিশক্তির বা ঐ জাতীয় দৃষ্টিগ্রাহ্য এর ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ অবিনশ্বর ফল প্রদান করতে সমর্থ। অস্ত্রের বলে মানুষের পরাভব ঘটানো যায়, কিন্তু হৃদয় জয় করা যায় না। এই হৃদয়ের জয়-ই হল শাশ্বত, শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দরের প্রকাশ।

সত্যাগ্রহকে Passive Resistance থেকে পৃথক করার জন্য গান্ধীজি বলতেন যে, বাহ্য অধিকার পাওয়ার জন্য এবং সকল সম্ভাব্য উপায় নিষ্ফল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজরা অনেক সময় Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই ধরনের উদাহরণ প্রচুর পাওয়ার যায়। ইংলন্ডের পার্লামেন্টে যখন শিক্ষা আইন পাশ করা হয়, তখন ইংলন্ডের সরকার অনুমোদিত গির্জা-বিরোধী (Non-Conformist) খ্রিশ্চানরা ডঃ ক্লিফোর্ডের (Cliford) নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল তা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Rasistance) নামেই পরিচিত। যেহেতু তারা দুর্বল এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য পন্থায় নিষ্ফল হয়েছিলেন, সেহেতু তারা শেষ পর্যায়ে এরূপ পন্থাই অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনে অথবা সুযোগের আবির্ভাবে হিংস্রতার পন্থাটিকেও অবলম্বন করেন। আরো উল্লেখ্য যে, ইংলন্ডের স্ত্রীলোকেরা তাদের ভোটাধিকারের দাবীতে যে বিরাট আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, তাও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নামে পরিচিত। অন্যান্য সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য পথ রুদ্ধ হওয়ায় তারা এই চরম পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি বর্ণিত এবং প্রদর্শিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন কখনই হিংসার পথকে অবলম্বন করে না। কারণ, একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী কখনই নিজেকে দুর্বল মনে করে না, সব সময়ই মনে করে যে সে আত্মিক বলে বলীয়ান। মানুষ নিজেকে যেভাবে মনে মনে করে, ক্রমে ক্রমে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। সে কারণেই আমরা যদি সবসময়ই মনে করি যে, আমরা দুর্বল, তাই আমাদেরকে গ্রাস করে নেবে। এভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা আমরা কখনই আমাদের প্রকৃত শক্তিকে বিকশিত করে তুলতে পারব না।

কিন্তু আমরা যদি প্রকৃত সত্যাগ্রহী হই, এবং নিজেদেরকে সবল মনে করে সত্যাগ্রহের অস্ত্র ব্যবহার করি, তাহলে এতে আমাদের লাভ হবে দুটি—**প্রথমতঃ,** 'আমরা বলবান' —এরূপ বিশ্বাস আমাদের দিনে দিনে আরো বলীয়ান করে তুলবে, এবং আমাদের আন্দোলনের তীব্রতা ও তেজ ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। **দ্বিতীয়তঃ,** এই শক্তি যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, ততই সত্যাগ্রহকে আঁকড়ে ধরে থাকতে

Scanned with CamScanner

আমাদের আগ্রহ আরো বর্ধিত হতে থাকবে। আসল কথা হল—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance) ক্ষেত্রে যেমন কোন প্রেমের স্থান নেই, তেমনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেই কোন বৈরীভাবের স্থান। ফলত Passive Resistance-এর ক্ষেত্রে সুযোগ মত অস্ত্রের ব্যবহার করা গেলেও, সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবকাশ ও সুযোগ সুবিধা থাকলেও অস্ত্রের ব্যবহার সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে সর্বদা প্রতিপক্ষকে উত্যক্ত করার পরিকল্পনা থাকে, কিন্তু সত্যাগ্রহে প্রতিপক্ষকে বিন্দুমাত্র আঘাত হানার পরিকল্পনা থাকে না। সত্যাগ্রহীরা তাই দৃঢ় দুঃখ ক্লেশ ভোগ করেও, প্রতিপক্ষকে জয় করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ফলত সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রতিপক্ষ এবং স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance শুধু বৈরী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়।

আরো উল্লেখ্য যে, গান্ধীজির আদর্শে সত্যাগ্রহীকে কিছু প্রত্যক্ষ কাজেও রত থাকতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সত্যাগ্রহী যে পাপ এবং অন্যায় দূরীভূত করতে চান, তার জন্য তাকে ব্যাপক ও নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে প্রথমে জনমত সংগঠিত করতে হয়। কারণ, কোনো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত ভালভাবে জাগ্রত হলে তবেই তা দূরীভূত করা সম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেক ব্যক্তি, এমন কি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি পর্যন্তও প্রকাশ্যে তা সমর্থন করতে সাহস পায় না। তাই গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে, জাগ্রত এবং বুদ্ধিদীপ্ত জনমতই হল সত্যাগ্রহের আসল এবং বৃহৎ অস্ত্র। একজন সত্যাগ্রহী প্রয়োজনে সামাজিক বহিষ্কারের অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন। যখন কোন ব্যক্তি সর্বজন গ্রাহ্য জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে কোন সামাজিক ব্যক্তিকে সমর্থ্য করে চলেন, তখন সেই ব্যক্তিকে সামাজিক ভাবে বহিষ্কারের কথা চিন্তা করা যায়। অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, সামাজিক বহিষ্কারের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির কিন্তু কোন প্রকার দৈহিক নির্যাতন করা চলবে না। সামাজিক বহিষ্কারের অর্থ হল—বহিষ্কৃত ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পূর্ণ অসহযোগ। এর মাধ্যমে বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি সচেতন ভাবে যে সমাজকে অস্বীকার করে চলেছেন, সেই সমাজের সেবা পাওয়ার কোনো অধিকার তার নেই।

সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এই সমস্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, গান্ধীজির পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন এক অত্যন্ত আদর্শপন্থী বিপ্লব—যার প্রয়োগ যেমন কঠিন, তেমনি ফলও সুদূরপ্রসারী। গান্ধীজি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সত্যাগ্রহের এরূপ আদর্শ প্রণয়নে তিনি আমাদের ধর্মশাস্ত্র গীতায় উক্ত "স্থিতধীর" আদর্শ গ্রহণ করেছেন। যদিও আমরা ইতিহাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রয়োগের বিরাট কোন নিদর্শন পাই না, তবুও বলা যায় যে, সত্যাগ্রহ হল মানুষের এক স্বাভাবিক ও আত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবে মানুষ অবশ্যই একজন সত্যাগ্রহী এবং অহিংসা পরায়ণ। যুদ্ধ ও হানাহানির প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ। কিন্তু সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা যেহেতু মানুষের স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ, সেহেতু তা নিঃশব্দে ক্রিয়া করে চলে। এইটি তাই সকলের বাহ্য দৃষ্টি এড়িয়ে ক্রিয়াশীল হয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে চেঙ্গিস খাঁর নিষ্ঠুরতা, বর্গী আক্রমণের বিভৎসতা, ঔরঙ্গজেবের পিতৃদ্রোহিতা এবং

Scanned with CamScanner

ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি যেভাবে প্রচার লাভ করেছে, সেভাবে কিন্তু প্রেমের ও অহিংসার আদর্শ প্রচার লাভ করে নি। তবুও বলা যায় যে, যীশুখ্রিস্টের অমানবিক মৃত্যুর পর তার প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার খ্রিস্টানরা যে প্রকার অত্যাচার সহ্য করেও শেষ অবধি জয়ী হয়েছিলেন, তাকে সত্যাগ্রহের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এরূপ আদর্শযুক্ত আন্দোলনকে কখনই বিস্মৃত হওয়া যায় না। উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়াও উল্লেখ করা যায় যে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীচৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে যে সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত করে তুলেছেন, সেগুলিকেও সত্যাগ্রহ আন্দোলন রূপে অভিহিত করা চলে, এবং এই সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সত্যনিষ্ঠার আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়—তাকে কখনই উপেক্ষা করা যায় না। মানুষের হৃদয়ের অন্তরে এগুলি চিরস্মরণীয় ও ভাস্কর হয়ে বিরাজ করবে।

অহিংসা ও স্বরাজ (Non-violence and Home Rule) ঃ গান্ধীজির অহিংসা নীতির দুটি মূল লক্ষ্য হল **'স্বরাজ' (Swaraj বা Home Rule)** এবং **"সর্বোদয়" (Sarvodaya)**। স্বরাজের প্রকৃতি অর্থ হল পূর্ণ স্বাধীনতা, আর সর্বোদয়ের অর্থ হল সকলের উন্নতি ও বিকাশ সাধনে এক আদর্শ সমাজ গঠন। অহিংসাই হল এই দুটি লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার অন্যতম সোপান।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন একজন রাজনৈতিক সাধক। রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কিভাবে মিলন সম্ভব—গান্ধীজির সমস্ত জীবন ছিল এই বিষয়ে এক কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে গান্ধীজি যতই তার জীবন সায়াহ্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ততই বেশি করে তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছিলেন যে, একজন দেশ-প্রেমিকের রাজনৈতিক জীবনে উৎকর্ষ বা আদর্শ তার ব্যক্তি জীবনের-আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা প্রভাবিত। গান্ধীজির স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণাটি এই বিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি মাত্র।

"স্বরাজ" শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো **"পূর্ণ স্বাধীনতা"**। স্বরাজের এই প্রকৃত অর্থটিকে উপলব্ধি করতে হলে তাকে "বিদেশী রাজ" শব্দটি থেকে পার্থক্য করা প্রয়োজন। কারণ, অনেকে মনে করেন যে, কোন দেশে বিদেশী রাজত্বের অবসান ঘটলেই সে দেশে 'স্বরাজ' প্রাপ্তি হয়েছে বলা যায়। কিন্তু গান্ধীজি 'স্বরাজ' শব্দটিকে এত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নি। যদিও বিদেশী রাজের অবসান কোন দেশের স্বরাজ লাভের পক্ষে একটি অপরিহার্য শর্ত, তবুও তা একমাত্র শর্তরূপে বিবেচিত নয়। স্বরাজের অর্থ হল আরো ব্যাপক বিদেশী রাজের অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং অপমানকর আইন কানুনের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হলেই আমরা স্বরাজ লাভ করি না। প্রায় দুই শতাধিক বৎসর ধরে যখন আমরা ইংরেজদের শাসনে পরাধীন ছিলাম, তখন আমরা ভাবতাম যে তাদের শাসন থেকে মুক্ত হতে পারলেই আমরা স্বরাজ লাভ করব। কিন্তু স্বরাজের অর্থ তা নয়। স্বরাজ হল বিদেশী-শাসনের অবসান এবং আরো কিছু বেশি বিষয়। এই বেশি কিছু বিষয়টি হল আত্মার পূর্ণ বিকাশ বা উপলব্ধি।

প্রকৃত অর্থে স্বরাজ হল মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, এমনকি

Scanned with CamScanner

জাতিগত—সর্ববিধ সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ। শুধু বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি লাভই স্বরাজ নয়। কারণ, বিদেশী শক্তি উৎখাত হওয়ার পরেও যদি আমাদের দেশে আর এক অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী দেশীয় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমরা স্বরাজ লাভ করেছি বলা চলে না। এক্ষেত্রে বিদেশী রাজের অত্যাচারের ধারাবাহিকতা থেকে গেছে বলা যায়। তাতে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ফ্রান্স থেকে ইংরেজ শক্তি বিদায় নেওয়ার পরেও যখন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক অমানবিক অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং ফ্রান্স বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত হলেও, স্বরাজ লাভ করেছিল বলে মনে করা যায় না। কারণ, সেক্ষেত্রে ইংরেজদের বিদায়ের অর্থ এই যে, তারা তখনও সেদেশে পরোক্ষভাবে থেকে গিয়েছে। একই রকম অত্যাচারের দ্বারা ফ্রান্সের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হোতো। তাই দাবী করা যায় যে, শুধু বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভই স্বরাজ নয়, স্বরাজ শুধু দেশীয় শাসন (Home Rule) নয়।

এ পর্যন্ত স্বরাজ কি নয়—সেই বিষয়টিই ব্যাখা বা বিবৃত করা হয়েছে। এখন স্বরাজ প্রকৃত পক্ষে কি তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন কি কি গুণের অধিকারী হলে, আমরা স্বরাজ লাভ করব? গান্ধীজির মতে, প্রকৃত স্বরাজ লাভ তখনই সম্ভব যখনই মানুষ জীবনের সর্ববিধ তথা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হবে। বিদেশী শাসন ও শোষণ আমাদের দেশ থেকে অবলুপ্ত হওয়ার পরও যদি আমরা তাদের শিক্ষাপদ্ধতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে থাকি, তাহলে সেটাও এক ধরনের দাসত্বের সামিল। আমাদের গোলামী করার অর্থই হল আমাদের দেশেরই বিদেশের কাছে গোলামী করা। সুতরাং আমরা যদি আমাদের নিজেকে গোলামী মুক্ত না করতে পারি, নিজেদের দায়িত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত হতে না পারি, তবে আমার দেশকেও আমি মুক্ত করতে পারব না। সুতরাং নিজেদের উপর সর্বপ্রকার স্বাধীনতার প্রয়োগ বা সর্বপ্রকারক আধিপত্যই হল স্বরাজ। যখন আমরা মনে-প্রাণে, ধ্যান-ধারণায় সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত এবং স্বীয় আত্মোপলব্ধির আদর্শের দ্বারা একান্তভাবে পরিচালিত, তখনই আমরা পূর্ণ স্বরাজের অধিকারী হয়েছে বলে দাবী করা যায়। আর এই লক্ষ্যে উন্নীত হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হল অহিংসা। অহিংসা ছাড়া মানুষের ব্যাহিক এবং আত্মিক—এই উভয় ধারায় পূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব নয়। অহিংসাই পূর্ণ বিকাশ ও স্বাধীনতার নির্ভরযোগ্য বাহন।

গান্ধীজির মতে, স্বরাজ একটি আদর্শ হলেও তাকে প্রকৃতপক্ষে লাভ করা সম্ভব। এ শুধু স্বপ্নিল কথার কথা নয়। কারণ, নিজের উপর সর্ববিধ আধিপত্যই যদি স্বরাজের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে অর্জন করা আমাদের নিজের হাতেই সম্ভব। স্বরাজ কেউ আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে না, তাকে অর্জন করে নিতে হয়। আবার স্বরাজ লাভ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয়। ফলে স্বরাজ এক চলমান সদর্থক শক্তি। স্বরাজের স্বাদ যতই পাওয়া যায়, ততই তা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ততই সে আরো উপলব্ধি করতে থাকে যে, তার আরো কিছু প্রাপ্য আছে। এ যেন এক অনাবিল আনন্দের রূপ ভূমানন্দ স্বরূপ। যাঁর ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটে, তিনি ততই সেই উপলব্ধির

Scanned with CamScanner

পথে অগ্রসর হন, ততই আরো বেশি করে আকৃষ্ট হন। এই উপলব্ধিজাত আনন্দ অনুভূতি চির বর্ধনশীল। যতই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততই অনুভব করা যায় যে, আরো কিছু পাওয়ার আছে, আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। স্বরাজের ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ সত্য পরিলক্ষিত।

আবার স্বরাজ অহিংসার প্রকাশক সত্য ও সুন্দরের অনুভূতির সহিত তুলনীয়। কোন সুন্দর জিনিষকে আমরা যেমন শুধু নিজেরা উপভোগ করেই সন্তুষ্ট হই না, তাকে অন্যদেরও উপভোগের বিষয়বস্তু করে তুলতে চাই ; তেমনি স্বরাজের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। স্বরাজের স্বাদ নিজে একবার পেলে তা অপরকে পাওয়ানোর জন্য সারাজীবন প্রচেষ্টা করে যেতেও ক্লান্তি বোধ হয় না। কারণ, প্রত্যেকের স্বরাজ লাভেই নিজের স্বরাজ লাভের বিষয়টি পূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। দেশবাসী যদি দরিদ্র ও বুভুক্ষা পীড়িত হয়, তবে আমার একার ধনরত্ন আমাকে শান্তি দিতে পারে না, আমার নৈতিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। আমার একার ধনরত্ন তাই আমাকে ম্লান ও লাঞ্ছিত করে তোলে। স্বরাজও তাই একার কাম্য নয়, সকলের ক্ষেত্রেই স্বরাজ লাভ একান্ত ভাবে কাম্য। গান্ধীজির এই আদর্শ তাই বুদ্ধদেবের সেই বাণীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা সকলেই তথাগত-সন্তান। সুতরাং যতক্ষণ একটি জীবও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ, ততক্ষণ আমার একার নির্বাণ আমাকে প্রকৃত অর্থে মুক্তি দিতে পারে না।

আমরা কি প্রকৃত অর্থে স্বরাজ লাভ করতে পেরেছি (Have we attained Swaraj in the true sense) ? দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরে আমার স্বাধীনতার উষ্ণ স্রোতে অবগাহন করছি। বলা যায় যে, গান্ধীজির আদর্শ অনুসৃত প্রকৃত স্বরাজ আমরা এখনও লাভ করি নাই। তাঁর ইপ্সিত স্বরূপ ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে বলে মনে হয় না। কারণ, আজও ভারতবর্ষে দরিদ্র ও হতভাগ্যরা ধনীদের অত্যাচারে জর্জরিত। আজও এখানে তথাকথিত উর্ধ্ব জাত্যাভিমানীরা তথাকথিত নীচ জাতির মানুষ ও হরিজনদের অস্পৃশ্য বলে মনে করে এবং ঘৃণাভরে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়। তারা কখনই তাদেরকে আমার রক্ত, আমার ভাই হিসাবে চিহ্নিত করে না। তাদেরকে অপাংক্তেয় বলে মনে করে, এবং তাদের সংস্পর্শে আসতে কুণ্ঠা বোধ করে। ভারতবাসীর অধিকাংশরই এরূপ মানসিকতা ও জাত্যাভিমান অবশ্যই ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয়। এখনও আমাদের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা ইংরাজী-সভ্যতার মোহ এবং যান্ত্রিক সভ্যতার লালসা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। পোষাকে, পরিচ্ছদে, ধ্যান-ধারণায়, আহারে-বিহারে সর্বপ্রকার বিদেশীয়ানার বর্জন এবং স্বদেশীয়ানার প্রতিষ্ঠাই হল প্রকৃত স্বরাজ। কিন্তু এখনও আমাদের সমস্ত দেশীবাসী তো দূরের কথা, রাজনৈতিক নেতারাও যারা স্বদেশ সেবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে সংকল্পবদ্ধ, তাঁরা মাদক বর্জন এবং স্বদেশীয়ানা গ্রহণের আদর্শটিকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করতে পারেন নি। তাদের ক্রিয়াকলাপ কখনই প্রমাণ করে না যে তারা দেশকে ভালবাসেন। তাই তাদের প্রচার করে বেড়াতে হয় যে তারা দেশপ্রেমিক। তাদের নিজেদের ক্ষমতার লোভ এবং স্বার্থের সংঘাত ও সংকীর্ণ মনস্কতা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা নিজেরাই স্বরাজের অধিকারী নয়। সুতরাং তারা আমাদের মত সাধারণ দেশবাসীকে স্বরাজের

Scanned with CamScanner

স্বাদ কখনই দিতে পারে না। এ যেন ঠিক সেরূপ উপমারই বিষয়, যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না, সে কিভাবে ডুবন্ত মানুষকে সাঁতারে উদ্ধার করবে? আবার স্বরাজ দেওয়া যায় না, তা উপলব্ধিগত ও অর্জনের বিষয়। তাকে অর্জন করে নিতে হয়। কিন্তু ভারতবাসীর নিত্যকার বিভিন্ন প্রকার সমস্যা তাকে এরূপ উপলব্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। হিংসায় জর্জরিত ভারতবাসী। অহিংসার মন্ত্রকে তারা আজও মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। ফলত বলা যায় যে আমরা আজ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে স্বরাজ লাভ করতে সমর্থ হই নি।

অহিংসা ও সর্বোদয় (Ahimsa and Sarvoday) : সর্বোদয়ের অর্থ হলো—সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উন্নত ও উৎকৃষ্ট সমাজ গঠন। সত্য ও অহিংসা হল একই মুদ্রার দুটি দিক। উভয়েই মানুষের সদিচ্ছা ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অহিংসা নীতির প্রয়োগে অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আমরা অন্যায়কারীর মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগাতে সক্ষম বলে গান্ধীজি মনে করেন। তাঁর মতে, অহিংসার ভাষা হল যুক্তি ও বিবেকের ভাষা। অহিংসা কখনো নিষ্ক্রিয়তাকে নির্দেশ করে না, তা সক্রিয়ভাবে মানুষের মধ্যে কর্মনিষ্ঠাকে জাগরিত করে। এই কর্মনিষ্ঠাই মানুষকে সর্বোদয়ে অনুপ্রাণিত করে। সর্বোদয়ের বুৎপত্তিগত অর্থ হল "সর্বাঙ্গীন বিকাশ"। এই সর্বোদয়ই হলো গান্ধীজির মৌল নীতি, তথা অহিংসার আর একটি প্রধান লক্ষ্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলেই ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজেরও সর্বাঙ্গীন বিকাশ কামনা করে। সুতরাং সমাজ সম্পর্কে সচেতনতাও সর্বোদয়ের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। গান্ধীজির সর্বোদয়ের ধারণার মূল উদ্দেশ্যই হল সমাজের মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ বা আত্মোপলব্ধি। সর্বোদয়ের ধারণাটিকে তাই হেগেলের পূর্ণতাবাদের (Perfectionism) সঙ্গে তুলনা করা যায়।

গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয়ের আদর্শটির ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রাস্কিনের (Ruskin) *Un to the Last* পুস্তকটির মাধ্যমে। একথা তিনি তাঁর *My Experiments with Truth* গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। গুজরাতি ভাষায় এরই নাম দিয়েছিলেন 'সর্বোদয়'—যার অর্থ হল—"সকলের কল্যাণ"। রাস্কিনের পুস্তকের তিনটি বিশেষ বক্তব্য গান্ধীজিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এগুলি হলো :—

(১) সকলের কল্যাণ বা মঙ্গলের মধ্যেই ব্যক্তির মঙ্গল নিহিত।

(২) কায়িক শ্রম এবং বৌদ্ধিক শ্রমের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই ; জীবন ধারণের জন্য উভয়েরই আয় করার অধিকার আছে।

এবং (৩) একজন শ্রমজীবির জীবন-ই কাঙ্খিত।

গান্ধীজির সর্বোদয় হল একটি পরিপূর্ণ জীবনদর্শন। কারণ, এতে পরিলক্ষিত হয় ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং মূল্যগত বিষয়ের ধ্যানধারণা। এই সর্বোদয়ের মূলে আছে কতকগুলি মৌল বিশ্বাস, এবং সেগুলি হল যথাক্রমে :

(১) মানব প্রকৃতি হল মূলত আধ্যাত্মিক।

(২) মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য হল—বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়।

(৩) বিশ্বের সমস্ত প্রকার প্রক্রিয়ার মধ্যে কল্যাণের আদর্শ ক্রিয়াশীল।

Scanned with CamScanner

(৪) সত্য ও অহিংসা হলো মানব জীবনের মৌল নীতি হিসাবে স্বীকৃত। এবং
(৫) এই সমস্ত আদর্শগুলিকে সামনে রেখে সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্ভব।

এই সমস্ত মৌল বিশ্বাস বা আদর্শগুলিকে সামনে রেখে সত্য ও অহিংসার মধ্যে উজ্জীবিত হয়ে সার্বিক কল্যাণকর যে সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন গান্ধীজি তার বাহ্যিক রূপ হল সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থা। এখানে ব্যক্তির যেমন আত্মোপোলব্ধি ঘটে তেমনি সমাজও তার পূর্ণতা বিকাশের সুযোগ লাভ করে এবং একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা রূপে পরিগণিত হয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকে সূচিত করে।

গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ ধারণার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ (Characteristics o Gandhian Concept of Sarvodaya Samaj) ঃ সর্বোদয় সম্পর্কে গন্ধীজি যে সর্বাঙ্গীন ও সর্ব্বোচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোদয় সমাজ ধারণার ক্ষেত্রে কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ—

প্রথমতঃ, গান্ধীজি সর্বোদয় সমাজের মাধ্যমে এক প্রকার সর্ব্বোচ্চ নৈতিক পরিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে একমাত্র উন্নত মানের নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়। এখানে শুধু কোন ব্যক্তির মঙ্গল-ই কাম্য নয়, কাম্য হল সমগ্র সমাজের কল্যাণ বা মঙ্গল।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বোদয় সমাজের মৌল নীতি হল সত্য ও অহিংসার নীতি। সত্যের মাধ্যমে নৈতিকতার আদর্শকে পূর্ণভাবে স্থাপন করা যায়, আর অহিংসার নীতির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ। স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে সমাজ হবে কালিমা ধৌত, বিভেদ ও বিদ্বেষ মুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ, সর্বোদয় সমাজের লক্ষ্য হল আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজি যদিও ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন, তবু তিনি প্রকৃত অর্থে আদর্শযুক্ত গণতন্ত্রের প্রয়াসী ছিলেন। এই গণতন্ত্র কিন্তু সংখ্যাধিক্যের শাসন নয়, এ হল সকলের শাসন। এখানে রাজনৈতিক দলের কোনো স্থান নেই। এরূপ সমাজ ব্যবস্থা তাই দলহীন গণতন্ত্রের দিশারী। এখানে সকলেই সমান, সকলেই শাসন কার্যের অংশীদার।

চতুর্থতঃ, গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল— তা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে তাই কোনো ধর্মেরই প্রাধান্য থাকবে না, থাকবে সব ধর্মের সমান অধিকার। বিশেষ কোনো ধর্মের অনুশাসনে শাসন কার্য পরিচালিত হবে না, ধর্ম-সমন্বয়ের অনুশাসনেই তা পরিচালিত হবে।

পঞ্চমতঃ, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করাও হল সর্বোদয় সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজের সকলের মধ্যে সাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এরূপ পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমেই তিনি শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন।

ষষ্ঠতঃ, সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থায় সকল ধরনের শ্রমের মূল্য সমানভাবে স্বীকৃত। পরিশ্রমের বিনিময়ে সকলকেই জীবন ধারণ করতে হবে। পরিশ্রম না করে কারোর দিনাতিপাত করা উচিত নয়। আর সকলেরই পরিশ্রম হলো সমান। একজন নাপিতের শ্রম আর একজন আইনজীবির শ্রম এক রূপেই স্বীকৃত।

Scanned with CamScanner

সপ্তমতঃ, সর্বোদয়ের মৌল প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বিনোবাভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রথমে গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে রামরাজ্য। 'রামরাজ্যে'র অর্থ কিন্তু হিন্দুরাজ্য নয়, এর প্রকৃত অর্থ হল—"ঈশ্বরের রাজত্ব" (Kingdom of God)। গান্ধীজির মতে ঈশ্বর হলেন সত্য ও ন্যায়ের বিধাতা। সুতরাং ঈশ্বরের রাজত্ব বলতে তিনি প্রকৃত আদর্শ গণতন্ত্রকে বুঝিয়েছেন, যেখানে সকলেই সত্য দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ন্যায় বিচার পাবে।

অষ্টমতঃ, গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় যে, তা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিরোধী। তাঁর মতে, ইউরোপীয় শিল্প সভ্যতায় নৈতিকতার কোন মূল্য নেই। কিন্তু সর্বোদয়ের আদর্শটি নৈতিকতার উপর-ই প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় গ্রাম্য জীবনই নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা মানুষকে বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ দেখাতে সমর্থ। সেজন্যই তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ করে যে সমস্ত গ্রাম অনুন্নত, অবহেলিত, সেই সমস্ত গ্রামেরই সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকে সর্বোদয়ের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করেছেন।

আসল কথা হল—যত রকম ভাবে সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব, তার সমস্ত কিছুই হলো সর্বোদয়ের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এ হল সামগ্রিক কল্যাণ বা মঙ্গলের প্রকাশ—যার ফল ভোগ করবে সামগ্রিক ভাবে সমাজ এবং তার অর্ন্তগত প্রতিটি মানুষ। সর্বপ্রকার উন্নয়নের এবং ধ্যান ধারণার প্রকাশ ঘটে থাকে এই আদর্শমূলক সর্বোদয় সমাজে। সাম্যের বীজটি তাই এই সর্বোদয় ধারণায় প্রতিষ্ঠিত এবং এর ফলেই সকল মানুষ সত্য ও অহিংসার পূজারী হিসাবে গণ্য।

গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ ধারণার সমালোচনা (Criticism of Gandhian Concept of Sarvoday Samaj) ঃ আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ গান্ধীজি প্রবর্তিত সর্বোদয় সমাজ ধারণার প্রভূত সমালোচনা করেছেন। সর্বোদয়ের ধারণাটি বিভিন্ন দিক থেকে কঠোরভাবে সমালোচিত ঃ

(১) গান্ধীজি প্রবর্তিত সর্বোদয় সমাজের ধারণাটি হল একটি আদর্শগত কাল্পনিক (Utopia) বিষয়। বাস্তব জগতে একে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। গান্ধীজি নিজেও এমন কোন নির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারেন নি যার মাধ্যমে সর্বোদয় সমাজ লাভ করা যেতে পারে।

(২) সর্বোদয়ের আদর্শে গ্রামরাজ থেকে রামরাজ্যের যে ছবি অঙ্কন করা হয়েছে, তা কল্পনায় রঙীন করে তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে দাবী করা হয়েছে যে মানুষ হবে স্বার্থশূন্য, পরার্থপর ও আত্মকামী। কিন্তু বাস্তবে এরূপ মানব চরিত্র পর্যবেক্ষণ খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। মানুষ হয় প্রকৃতিগত ভাবেই স্বার্থপর এবং হিংস্র।

(৩) সর্বোদয়ের ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় সবকিছুই সাধারণভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে পরিচালিত হবে। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে এরূপ সর্বসম্মতি রূপ খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত থাকা খুবই স্বাভাবিক। আরো উল্লেখ্য যে, চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে আরো ভালো

Scanned with CamScanner

কিছু নিঃসৃত হতে পারে। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যে একটা দারুণ মূল্য আছে—যা একটা সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সর্বোদয়ের ক্ষেত্রে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। একেই দেবদত্ত তাঁর *Sarvodaya, our times and Gandhi*—প্রবন্ধে 'Cult of Concensus' রূপে অভিহিত করেছেন।

(৪) গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজে যে দলহীন গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, তা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক যুগে তো এরকম সমাজ ব্যবস্থা একটি আদর্শের ব্যাপার, বাস্তবে এর কোনো স্থানই নেই। কারণ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা হলো জাতি, ধর্ম ও বর্ণ হিসাবে বহুধা বিভক্ত। প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ রক্ষায় অত্যন্ত তৎপর। আর এজন্যই সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কালের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতেই হয়। তাই বলা যায় যে, গান্ধীজির পরিকল্পিত দলহীন সমাজ ব্যবস্থা এক অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র।

(৫) এমন কোনো সমাজ ব্যবস্থা দেখা যায় না যেখানে কোনো প্রকার বৈষম্য নেই। সুতরাং বৈষম্যমূলক ও অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় সর্বোদয়ের আদর্শ রূপায়িত করতে গেলে বৈষম্য কমার পরিবর্তে তা বৃদ্ধিই পাবে। কারণ, এক্ষেত্রে যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে তারাই শুধু তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার সুযোগ পাবে। গান্ধীজি ঠিক এ জিনিষটা বুঝে উঠতে পারেন নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের অবস্থাই গান্ধীজির এই ভ্রান্ত ধারণা প্রমাণিত করে।

(৬) সর্বোদয়ের ধারণা যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধী। এর ফলে তা প্রগতির পরিপন্থী বলে স্বীকৃত। কারণ, আধুনিক কালে শুধু যান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষ এবং সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যন্ত্র-সভ্যতায় কিছু ত্রুটি আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে যন্ত্রকে দায়ী করা ঠিক নয়। যান্ত্রিক সভ্যতায় কুফলের জন্য দায়ী হলো সমাজ। সমাজেরই উচিত হলো যন্ত্রকে কিভাবে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো যায়, তা অনুসন্ধান করা। সুতরাং যান্ত্রিক সভ্যতা পরিতাজ্য নয়।

(৭) সর্বোদয়ের ধারণায় শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদীরা এর চরম বিরোধিতা করে বলেন যে, শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা একেবারেই অবাস্তব। যতদিন সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিনই সমাজের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষ থাকবেই। বুর্জোয়া এবং প্রলিতারিয়েতদের সংঘাত, সমাজে অনিবার্য সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও বলা যায় যে, গান্ধীজি শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার যে কথা বলেছেন তা শ্রেণীহীন নয়, আসলে তা হল শ্রেণীসমন্বয়।

(৮) সর্বশেষে বলা যায় যে, গান্ধীজি সর্বোদয়ের ধারণাটিকে দুটি মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এই দুটি মৌলনীতি হলো সত্য (Truth) এবং অহিংসা (Non-violence)। কিন্তু সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সত্য এবং অহিংসা বোধ জাগরিত হবে—গান্ধীজির এমন আশা একেবারেই অসম্ভব। সমাজের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিনই সমাজের মধ্যে সত্য ও অহিংসার পাশাপাশি মিথ্যা ও হিংসার প্রভাব থাকবেই। এটাকে অস্বীকার করার অর্থ হলো সমাজের প্রকৃত তথা বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করা—যা আদৌ কাম্য নয়।

Scanned with CamScanner

অহিংসা।

70. 'অহিংসা' শব্দটি সদর্থক না নঞর্থক শব্দ? (Is non-violence a Positive or Negative word ?)

উত্তর ঃ 'অহিংসা' শব্দটির মধ্যে একটি নঞর্থক ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হলেও, তাকে সদর্থক শব্দ রূপেই গণ্য করা হয়। কারণ, অহিংসা মানে শুধু মাত্র হিংসা না করা নয়। হিংসা না করেও সদর্থক ভাবে কোন কিছু করাকেই বলা হয় অহিংসা।

71. ব্যক্তিজীবনে অহিংসার কি কোন ভূমিকা আছে? (Is there any role of Non-violence in Individual life ?)

উত্তর ঃ ব্যক্তিজীবনে অহিংসার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। কারণ, অহিংসার মাধ্যমেই ব্যক্তির নৈতিক জীবন উন্নততর হতে পারে। একমাত্র অহিংসার মন্ত্রেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

72. সমাজ-জীবনে অহিংসার ভূমিকা কি? (What is the role of Non-violence in Social life ?)

উত্তর ঃ অহিংসার একটা সামাজিক ভূমিকা অবশ্যই বিদ্যমান। কারণ, একমাত্র অহিংসাই সমাজজীবনে শান্তি এবং উন্নতি আনয়ন করতে পারে। সামাজিক অগ্রগতি অহিংসার মন্ত্রেই সম্ভব। সেকারণেই গান্ধীজি সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই অহিংসাকে মৌল ভিত্তিরূপে গণ্য করেছেন।

73. স্বরাজ কাকে বলে? (What is Swaraj ?)

উত্তর ঃ সাধারণ অর্থে 'স্বরাজ' হল 'দেশীয় শাসন' (Home Rule)। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বরাজ হল সমস্ত প্রকারের দাসত্ব মোচন"। অন্তরে পূর্ণ স্বাধীনতাই হল—প্রকৃত স্বরাজ।

74. স্বরাজের সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক কি? (What is the relation of Swaraj with Ahimsa ?)

উত্তর ঃ অহিংসা হল স্বরাজের মৌলভিত্তি। কারণ, হিংসার মাধ্যমে অন্তরে শুচিতা রক্ষা করা যায় না। অন্তরের শুচিতা না থাকলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। আর একমাত্র আত্মোপোলব্ধির মাধ্যমেই প্রকৃত স্বরাজ লাভ করা যায়।

75. গান্ধীজির মতে আমরা আজও কি প্রকৃত অর্থে স্বরাজ লাভ করতে পেরেছি? (Whether according to Gandhiji we have achieved Swaraj till today in its true sense ?)

উত্তর ঃ গান্ধীজির মতে আমরা আজ পর্য্যন্তও প্রকৃত অর্থে স্বরাজ লাভ করতে পারিনি। কারণ, বিদেশী তথা ইংরেজরাজের অবসান হলেও আমরা ভাবধারায় আজও তাদের উত্তরসূরী হিসাবে গণ্য।

Scanned with CamScanner

76. সত্যাগ্রহ কাকে বলে? (What is Satyagraha ?)

উত্তর ঃ সত্য + আগ্রহ = সত্যাগ্রহ। অর্থাৎ, "সত্যাগ্রহ' হল-"সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বা আগ্রহ"। গান্ধীর মতে, ইহা একটি মানব-জীবনের আদর্শ। মানুষের জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি আদর্শগত ও সার্থক পদ্ধতি রূপে পরিগণিত।

77. অহিংসার সঙ্গে সত্যাগ্রহের সম্পর্ক কি? (What is the relation between Ahimsa and Satyagraha ?)

উত্তর ঃ অহিংসার সঙ্গে সত্যাগ্রহের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কারণ, অহিংসার মন্ত্র মানুষের অন্তরে না থাকলে, সত্যাগ্রহের আদর্শটিকে আদৌ প্রয়োগ করা যায় না। সত্যাগ্রহের মূল ভিত্তিই হল অহিংসা।

78. সর্বোদয় কি? (What is Sarvodaya ?)

উত্তর ঃ সর্বোদয় হল একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন। সর্বোদয়ের লক্ষ্য হল এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মঙ্গল নয়, সমগ্র সমাজের মঙ্গল বা কল্যাণ হল একমাত্র কাম্য। সর্বোদয়ের বুৎপত্তিগত অর্থ হল—"সকলের কল্যাণ"।

79. গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয়ের ধারণাটি কোথা থেকে পেয়েছেন? (Where from Gandhiji received the concept of Sarvodaya ?)

উত্তর ঃ গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয়ের ধারণাটি রাস্কিনের (Ruskin) বিখ্যাত গ্রন্থ "Unto the Last" থেকে পেয়েছেন।

80. গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয়ের ধারণাটি কোন্ পুস্তকে প্রথম ব্যক্ত করেন? (In which book Gandhiji expressed first his concept of Sarvodaya ?)

উত্তর ঃ গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয়ের ধারণাটিকে তাঁর আত্মজীবনীমূলক পুস্তক "My Experiments with Truth"-এ প্রথম ব্যক্ত করেন।

81. সর্বোদয়ের মৌল ভিত্তি কি? (What are the basis of Sarvodaya ?)

উত্তর ঃ গান্ধীজির মতে, সর্বোদয়ের মূলে আছে চারটি বিশ্বাস ঃ

(1) মানুষের প্রকৃতির প্রধান দিক হল আধ্যাত্মিক।

(2) মানুষের জীবনের মর্মবস্তু হল বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঐক্য।

(3) সমস্ত প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে কল্যাণকর নিয়ম প্রযোজ্য।

এবং (4) এই নিয়মকে অনুসরণ করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পুনর্বিন্যাস সাধন।

82. সর্বোদয়ের সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক কি? (What is the relation between ahimsa and Sarvodaya ?)

উত্তর ঃ গান্ধীজি আসলে তাঁর সর্বোদয়ের ধারণার মাধ্যমে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা ঘোষণা করেছেন। এই ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী-সমন্বয়ের কথা বলেছেন। আর এরূপ শ্রেণী-সমন্বয় একমাত্র সম্ভব হয়ে উঠতে পারে অহিংসার মাধ্যমে। সুতরাং অহিংসাকে বাদ দিয়ে সর্বোদয়ের ধারণা একেবারেই অচল।

Scanned with CamScanner

1. অহিংসা কাকে বলে? অহিংসা কি একটি নঞর্থার্থক শব্দবোধক না সদর্থক শব্দবোধক? "অহিংসা" কি "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের" সমার্থক? গান্ধীকে অনুসরণ করে আলোচনা কর।

(What is non-violence ? Does this term indicate a negative sense or a positive one ? Is it equivalent with the term "passive resistance" ? Discuss after Gandhi.)

2. সত্য এবং অহিংসার বিষয়টিকে গান্ধীজি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা আলোচনা কর।

(Discuss after Gandhi the concept of Truth and Non-violence as depicted in his "Non-violence in Peace and War".)

3. ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজজীবনে অহিংসার ভূমিকা কি তা উল্লেখ কর। অহিংসা কি মানবজীবনের একটি আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে? আলোচনা কর।

(What is the role of non-violence in individual and Social life ? Can non-violence be treated as an ideal of humans life ? Discuss.)

4. স্বরাজ কাকে বলে? স্বরাজ লাভের ক্ষেত্রে অহিংসার ভূমিকা আলোচনা কর।

(What is Swaraj ? Discuss the role of Non-violence in the achivement of Swaraj.)

5. স্বরাজ আমাদের কাম্য কেন? আমরা কি আজও প্রকৃত অর্থে স্বরাজ লাভ করতে পেরেছি? গান্ধীজিকে অনুসরণ করে আলোচনা কর।

(Why Swaraj is desired ? Are we able to achieve Swaraj take today in the true sense of the term ? Discuss after Gandhi.)

6. সত্যাগ্রহ বলতে কি বোঝ? সত্যাগ্রহের সঙ্গে অহিংসার সম্পর্কটিকে উপস্থাপিত কর।

(What do you mean by Satyagraha ? State the relation on between Satyagraha and Ahimsa.)

Scanned with CamScanner

7. সর্বোদয় কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি তা গান্ধীকে অনুসরণ করে আলোচনা কর।

(What is Sarvodaya ? What are its features ? Discuss after Gandhi.)

8. অহিংসা কিভাবে সর্বোদয়ের ধারণাটিকে প্রভাবিত করে তা গান্ধীজির অনুসরণে আলোচনা কর।

(Expalain after Gandhi how the concept of Sarvodaya is influenced by the concept of Ahimsa.)

9. সর্বোদয়ের ধারণার একটি আলোচনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত কর।

(Represent a critical appreciation on the concept of Sarvodaya.)

Scanned with CamScanner